এ পদক কার আকবর খালেদার না বাংলাদেশের

লিখেছেন **গোলাম মোর্তোজা**

সাপ্তাহিক ২০০০ যখন লক্ষ্মীপুরের তাহেরের কথা লিখেছে তখন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ গুরুত্ব দেয়নি। হুমকি দিয়েছে, বলেছে মিথ্যা রিপোর্ট। ইকবালের মিছিল থেকে গুলি করে মানুষ খুনের সেই আলোচিত ছবি বিষয়ে আওয়ামী লীগের সেই বিখ্যাত উক্তি 'ছবি সব সময় সত্যি কথা বলে না' নিশ্চয়ই মানুষ ভুলে যায়নি। এ ছিল সরকারি দলের আওয়ামী লীগের দৃষ্টিভঙ্গি। বিরোধীদলের আওয়ামী লীগের অবস্থা কী? এখন তারা মনে করে সাংবাদিকরা সত্য লিখছেন। এমন কী সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনেক রিপোর্ট তারা উল্লেখ করছেন, তাদের প্রয়োজনে। যে কাজটি বিরোধীদলে থাকাকালীন বিএনপিও করেছে। ক্ষমতাসীন বিএনপি'র মনোভাব কী? ক্রমশ তাহের হয়ে ওঠা লক্ষ্মীপুরের সাহাবুদ্দিন সাবু'র কথা লিখেছি আমরা। বিএনপি মোটেই গুরুত্ব দেয়নি। বিএনপির একজন সংসদ সদস্য বলেছেন সাবু খুবই ভালো মানুষ। সাপ্তাহিক ২০০০ তার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা লিখেছে। সাবু তার সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছে। ফেনির হাজারীর জনসভায় দাঁড়িয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'ঢাকায় গিয়ে আমি সম্পাদকদের বলব তারা কেন আমার নেতাকে নিয়ে মিথ্যা কথা লিখেছেন।' এখন দৃষ্টান্ত আরো অনেক দেয়া যায়। তবে সেটা এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য নয়। প্রসঙ্গটির অবতারণা এই কারণে সে সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ওপর বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বিরোধী দলে। তখন সাংবাদিকদের তারা খুবই ভালো মানুষ মনে করেন, বিশ্বাস করেন। একবার ক্ষমতায় গেলেই পূর্বের বিশ্বাস আর থাকে না। তখন সাংবাদিকরা সবচেয়ে খারাপ মানুষ, সাংবাদিকরা যা লেখে তার সবই মিথ্যা। আমাদের দুটি রাজনৈতিক দলের প্রায় প্রতিটি নেতার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য।

ডেনমার্কের সরকারি সাহায্য সংস্থা ড্যানিডা বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী কর্নেল আকবরকে আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্নীতিবাজ আখ্যা দিল সম্প্রতি। এটা সত্যি কী মিথ্যা, সেটা ভিন্ন কথা বা তদন্ত সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু প্রেক্ষাপটটি যে অনেক দিন আগে থেকেই তৈরি হচ্ছিল সেটা বোঝা যাচ্ছিল। এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক ২০০০-এ। কিন্তু যথারীতি এই রিপোর্টের কোনো গুরুত্ব দেয়নি সরকার। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে।

গত ২২ মার্চ। সাপ্তাহিক ২০০০ জানতে পারে বিআইডব্লিউটিসিকে দেয়া অনুদানের ১৪৪ কোটি টাকা ফিরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ড্যানিশ সরকার। নৌপরিবহন মন্ত্রী কর্নেল আকবর উক্ত প্রকল্পে স্থানীয় এজেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে কমিশন পাওয়ার চেষ্টা করছেন। আর সে কারণেই তাদের এই সিদ্ধান্ত। এরপর আমরা একাধিকবার মন্ত্রী কর্নেল আকবরের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি। কিন্তু মন্ত্রী সময় দিতে পারেননি। এরপর যোগাযোগ করি বিআইডব্লিউটিসির চেয়ারম্যান এমএ মতিনের সঙ্গে। তিনি অনুদান প্রত্যাহারের বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান। সাপ্তাহিক ২০০০-এর ২৩ মার্চ সংখ্যায় বিষয়টি নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদন প্রকাশের পর নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বিআইডব্লিউটিসি'র ভেতরে বেশ তোলপাড় শুরু হয়। তারা পুরো বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করতে থাকে। প্রায়

প্রতিদিনই মন্ত্রণালয় এবং বিআইডব্লিউটিসি ভবনে মিটিং চলতে থাকে। ড্যানিশরা অনুদান প্রত্যাহারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে, বিষয়টি তারা প্রকাশ করে দেবে– এ কথা মন্ত্রী আকবর হয়তো আগেই জেনেছিলেন। এ কারণে শেষ মুহূর্তে যে কোনো মূল্যে অনুদান প্রত্যাহার ঠেকানোর জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। ড্যানিশদের যে কোনো প্রস্তাবে তিনি রাজী আছেন এমন অঙ্গীকারও করেন। কিন্তু তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। বাংলা বর্ষ ১৪০৮-এর শেষ দিনে অর্থাৎ ১৩ এপ্রিলে ডেনিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি রাষ্ট্রদূত পিটার হ্যানসেন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে অনুদান প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত জানান। কোনো রাষ্ট্রদূতের মুখে বাংলাদেশের কোনো মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির এমন সরাসরি অভিযোগ এই প্রথম। এ হিসেবে বাংলাদেশ 'অর্জন' করলো নতুন মেডেল।

ড্যানিডার থেকে এভাবে দ্বিতীয় পদকটি পেলাম আমরা। প্রথমটি পেয়েছিলাম বিগত সরকারের সময়। সেটা দিয়েছিল ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল। দুর্নীতিতে বিশ্বের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে, অসম্ভব ভালো ভালো কথা বলে ক্ষমতায় এলো বিএনপি সরকার। বয়স মাত্র ছয় মাস। এর মধ্যেই পদক পাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে গেল। ড্যানিশ সরকারি সাহায্য সংস্থা সরাসরি পদকটি নৌপরিবহনমন্ত্রী কর্নেল আকবরের গলায় পড়িয়ে দিলেন। কিন্তু এই পদক কী শুধু আকবর একাই পেলেন? না এর অংশীদার আমরাও? হ্যা এই পদক শুধু আকবর একা পাননি। এই পদক পাওয়ার মধ্য দিয়ে প্রমাণ হলো বর্তমান বিএনপি সরকার দুর্নীতিবাজ। দুর্নীতির এই অভিযোগ থেকে বাদ যান না খালেদা জিয়াও। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের মানুষ দুর্নীতিবাজ সেটা আর একবার প্রমাণ হলো। প্রমাণ হলো শব্দটি হয়তো এখানে সঠিক নয়। কারণ বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে কৃষকরা। কৃষক দেশের প্রাণ। সেই কৃষক কোনোদিন দুর্নীতি করে না, করতে পারে না। তার দুর্নীতি করার সুযোগই নেই। যুগ যুগ ধরে সে নিপীড়িত, নির্যাতিত। সেই কৃষকেরও পরিচিতি আজ দুর্নীতিবাজ হিসেবে। দুর্নীতি করে রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, আমলা। আর অংশীদার হতে হয় আমাদের সবাইকে। নিয়তির কী নির্মম পরিহাস!

এদেশের রাজনীতিবিদ-মন্ত্রী, আমলা এই সম্প্রদায়ের মানুষের দুর্নীতির বিষয়টি নিয়ে কারো মনে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। সবাই জানে এরা দুর্নীতি করে। এটা ওপেন সিক্রেট বিষয়। তাই কর্নেল আকবরের বিরুদ্ধে যখন ড্যানিডা দুর্নীতির অভিযোগ আনলো, তখন কোনো মানুষই অবিশ্বাস করেনি। আকবর যদিও জোর দিয়ে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করছেন। কিন্তু মানুষ তার কথা বিশ্বাস করছে না। অভিযোগটি সত্য বা অসত্য প্রমাণের আগেই মানুষ পৌঁছে গেছে সিদ্ধান্তে। অভিযোগটি যেহেতু রাজনীতিবিদ বা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, সুতরাং সত্যি হতেই পারে সাধারণ

৬ মাস বয়সী বিএনপি সরকারের সবচেয়ে বড় পরিচিতি তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। মূলত সিদ্ধান্তহীনতার কারণেই সরকারের এই লেজেগোবরে অবস্থা। শুরুতেই ষাট সদস্যের একটি বিশাল মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে রেকর্ড করেছে

মানুষের ধারণা এমনই। মানুষের মনে এমন বিশ্বাস জন্মানোর কারণটি কিন্তু গত ৩০ বছর ধরে রাজনীতিবিদ এবং আমলারাই তৈরি করেছেন।

অর্থমন্ত্রী কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়ায় ড্যানিশ সরকার অনুদান প্রত্যাহার এবং সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তা দেশের মানুষকে জানানোর পদক্ষেপ নেয়। বাংলাদেশ সরকারের মতানুযায়ী, ড্যানিডার এই কাজ কূটনৈতিক শিষ্টাচার বিবর্জিত। তাদের পদক্ষেপ ত্রুটিমুক্ত ছিল না বলেও মনে করে বাংলাদেশ সরকার।

এই মনে করাটা হয়তো ঠিকই আছে। কিন্তু ড্যানিডা যখন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানকে জানালো, তখন তিনি কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিলেন না কেন? অর্থমন্ত্রীর কাজ তো শুধু কথা বলা নয়। এই পদক পাওয়ার দায়-দায়িত্ব তো তার ওপরও পড়ে। সাইফুর রহমান শুধু কথা বলবেন, আর মানুষ তা শুনে হাসবে এটা তো হতে পারে না।

রাজনীতিবিদ-মন্ত্রী, আমলারা নিজেরা কাজ করেন না, অন্যদেরও করতে দিতে চান না। নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেন, করার চেষ্টা করেন। ড্যানিডা সংবাদ সম্মেলন করার আগে অর্থমন্ত্রীকে চিঠি লিখে বিষয়টি অবগত করেছেন। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ড্যানিডা অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানকে চিঠি দিয়ে জানায়, নৌপরিবহন মন্ত্রী কর্নেল আকবর স্থানীয় নিয়োগের মাধ্যমে কমিশন খাওয়ার চেষ্টা করছেন। একটি বড় সাহায্য সংস্থা একটি দেশের একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অভিযোগ করলো আরেক জন মন্ত্রীর কাছে। অথচ সেই মন্ত্রী বিষয়টির কোনো গুরুত্বই দিলেন না।

সাবেক অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া শেয়ার বাজার ধসের পরে উল্টোপাল্টা বক্তব্য দিয়ে লোক হাসিয়েছিলেন। অর্থনীতির ছাত্র হয়েও লোকজনকে নয়ছয় বোঝানোর চেষ্টা ছিল বিরক্তিকর। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সাইফুর রহমান এ দিক থেকে দারুণ স্মার্ট। যা বলেন তা ভুল অন্তত বলেন না। কথার মার প্যাঁচ এবং পরিসংখ্যানের ফাঁকির মাধ্যমে তিনি পার পাবার চেষ্টা করেন। তার পদ্ধতি পুরো সত্য না বলা। অর্ধেক তথ্য জাহির করে তিনি নিজের দাবি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। সম্প্রতি বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে তিনি যে বক্তব্য দিয়েছেন এটা তার চিরাচরিত কৌশলের নয়া নিদর্শন।

তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন বেশি বৈদেশিক সাহায্য দিয়েও জাপান হৈ চৈ কম করে। এটা তাদের এশীয় মনোভাব এবং সংস্কৃতির প্রতিফলন। কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে নয়। তার তুলনায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন কম সাহায্য দিয়েও হৈ চৈ করে বলে অভিযোগ করেছেন। এটাও সত্যি, ইউরোপিয় ইউনিয়নের দেশগুলোর আর্থিক নীতি একটি পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। যেখানে স্বচ্ছতাই মূল কথা। অর্থ, সুদের হার ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে এই পরিষদ। তাই অলাভজনক বা অনুন্নত খাতে ঋণ, অনুদানের ব্যাপারে প্রশ্ন ওঠাটাই স্বাভাবিক। সাধারণভাবে চিন্তা করুন। আপনি ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে ব্যাংকে টাকা ফেরত দিতে হয়। জবাবদিহি করতে হয়। অপারগতায় আর্থিক দন্ডও দিতে হয়। দুই দেশের মধ্যে ঋণের লেনদেনে অবস্থাটি অনেকটা সে রকমই। অনুদানে অবশ্য বেশিরভাগ সময় এ অবস্থা প্রয়োজন নয়। অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন আর্থিক সাহায্য হয়। তাই ব্যাপারটি বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক। ইতিবাচক হতো যদি উন্নতির জন্য আর্থিক সাহায্য কমতো। বাস্তবে হয়েছে উল্টো, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ ইত্যাদি বাংলাদেশের অবকাঠামো, দুর্নীতি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সততা নিয়ে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেছে। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অবস্থা অনুরূপ। বারবার সতর্ক করার পরও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।

নেপথ্য কাহিনী

লিখেছেন **আসাদুর রহমান**

প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, খাতভিত্তিক সহায়তা প্রকল্পের আওতায় ২০০০ সালের মে মাসে ড্যানিশ সরকারের সহায়তায় ১০টি ফেরি ও ৯টি জেটি সংস্কার ও পুনঃস্থাপনের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ ও ডেনমার্কের মধ্যে সমঝোতা হলে নবেম্বর মাসে দরপত্র আহ্বান করা হয়। কিন্তু প্রথম দফায় যে দর পাওয়া যায় তা গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সেটি বাতিল করে দিয়ে ২০০১ সালের আগস্ট মাসে নতুন করে দরপত্র আহ্বান করা হয়। এবার তিনটি কোম্পানিকে বিবেচনায় রাখা হলেও একটি দরপত্র থেকে সরে যায় ও অপর দুটি মিলিত হয়ে জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি গঠন করে। দীর্ঘদিন অচলাবস্থায় থাকার পর ডেনমার্ক চলতি ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানির সঙ্গে সমঝোতার উদ্যোগ নেয়া হয়।

সরকারি সূত্রগুলো বলছে, এই সমঝোতা উদ্যোগে বাংলাদেশের দু'জন প্রতিনিধি অংশ নিতে কোপেনহেগেনে যান। এ সময় মন্ত্রী ওই আলোচনায় কোনো অঙ্গীকার না করতে প্রতিনিধি দলকে নির্দেশ দেন এবং ইঞ্জিনমূল্য নিয়ে কথা বলতে বলেন। মন্ত্রী পরবর্তী আলোচনা ঢাকায় হবে তাও নিশ্চিত করতে বলেন। দুই প্রতিনিধি ঢাকায় ফিরে এসে আলোচনার একটি প্রতিবেদন জমা দিলে মন্ত্রণালয় এই দর তাদের জন্য প্রত্যাশানুরূপ নয় বলে মন্তব্য করে। তবে নৌপরিবহন মন্ত্রী তুলনামূলক দরপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের একটি শিপইয়ার্ড বাছাই করে প্রধান ইঞ্জিন ছাড়া অন্যান্য সংস্কারমূলক কাজ সম্পন্ন হবে এমন একটি বিধান রাখার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ডেনমার্ক দরপত্রের এই পর্যায়ে এসে শিপইয়ার্ড বাছাইয়ের জন্য নতুন করে টেন্ডার ডাকা সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করে দর সমঝোতার মাধ্যমে শিপইয়ার্ড নির্ধারণের প্রস্তাব করে। কিন্তু নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় তাতে সম্মত হয়নি। দু'পক্ষই তাদের প্রস্তাবে অনড় থাকলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।

সূত্র জানায়, এই পর্যায়ে নৌপরিবহন মন্ত্রী একজন ব্যবসায়ীকে মধ্যস্থতা করতে ঢাকায় ড্যানিশ দূতাবাসে পাঠান। ওই ব্যক্তি দূতাবাসে গিয়ে এ ব্যাপারে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা তৈরির প্রস্তাব করেন। বিনিময়ে তিনি কিছু ব্যবসায়িক সুবিধা দাবি করেন। একই সময় মন্ত্রী ডেনমার্কের কর্মকর্তাদের পাশ কাটিয়ে ড্যানিশ কোম্পানিটির সঙ্গে একান্ত বৈঠক করার উদ্যোগ নেন। এই দুটির কোনোটিকেই ভালোভাবে নেয়নি ড্যানিশ প্রতিনিধিরা। ঢাকায় ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত পরিস্থিতির বিবরণ দিয়ে এবং নৌপরিবহন মন্ত্রীর তৎপরতাকে 'দুর্নীতির ইচ্ছা' হিসেবে অভিহিত করে অর্থমন্ত্রীকে চিঠি লেখেন। চিঠির অনুলিপি পাঠানো হয় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগেও।

১৫ এপ্রিল মন্ত্রী কর্নেল আকবর 'স্থানীয় এজেন্ট নিয়োগ' সংক্রান্ত বিষয়ে দূতাবাসে কাউকে পাঠানোর বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, কর্নেল মুজিব নামে এক ব্যক্তি ড্যানিডার স্থানীয় এজেন্ট হতে আমার কাছে এসেছিল। আমি তাকে কিছুই বলিনি। কর্নেল মুজিব সম্পর্কে একই কথা বলেছেন মন্ত্রণালয়ের সচিব গোলাম রহমান। গোলাম রহমান ২০ ফেব্রুয়ারি ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূতকে লেখা চিঠিতে কর্নেল মুজিবের বিষয়টি উত্থাপন করেন।

বিষয়টি বর্তমানে যে পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে লক্ষ করলে দেখা যায়, এই সমস্যাটির সৃষ্টির পেছনে মূলত দুই ব্যক্তির ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একজন মন্ত্রীর শ্যালক হিসেবে পরিচিত। যার নাম, ঠিকানা কিছুই দূতাবাসের পক্ষ থেকে এখনও জানানো হয়নি। দূতাবাসের অভিযোগ মন্ত্রণালয় থেকে লোকাল এজেন্ট হবার জন্য তাকে দূতাবাসে পাঠানো হয়েছিল। অন্যদিকে মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ, কর্নেল মুজিব নামের এক ব্যবসায়ীকে লোকাল এজেন্ট হবার জন্য দূতাবাসের পক্ষ থেকে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল। দুপক্ষই সেই দুই ব্যক্তিকে পাঠানোর কথা অস্বীকার করছে। দূতাবাস বা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এদের কারোই পরিচয় নেই মন্ত্রণালয় ও দূতাবাস হাস্যকর দাবি করে চলেছে। কিন্তু সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে এই দুই ব্যক্তির আংশিক পরিচয় বের হয়ে এসেছে।

দূতাবাসে শ্যালক পরিচয়ে যে ব্যক্তিটি গিয়েছিল সাপ্তাহিক ২০০০-এর সূত্র অনুযায়ী সে ব্যক্তি মন্ত্রীর দ্বিতীয় স্ত্রীর ভাই। কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ বিমানের এক বিমানবালাকে নিয়ে বিদেশে পাড়ি দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কর্নেল আকবর আলোচনায় এসেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি সেই মেয়েকে বিয়ে করেন। সূত্র মতে, মন্ত্রীর দ্বিতীয়

এ কারণেই আর্থিক সাহায্যের পরিমাণে কমে গেছে। বৈদেশিক ঋণ, অনুদান কমলেও বিনিয়োগ কিন্তু সেই হারে কমেনি। উপরন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতির ভারসাম্য বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল। বৈদেশিক নীতির পরিবর্তন। অর্থনৈতিক অবস্থার রদবদল বাংলাদেশের জন্য কতোটা নেতিবাচক হতে পারে তার প্রমাণ হিসেবে সেপ্টেম্বর ১১-এর ঘটনাটিই যথেষ্ট। এই ঘটনার পর বৈদেশিক আয়ে যে ঘাটতি দেখা গেছে তা এখনও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। বৈদেশিক অর্থনীতির পরিবর্তন বিভিন্ন পণ্যের দাম এবং সহজলভ্যতার ওপরও প্রভাব ফেলবে। যা আমাদের অর্থনীতিকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমাবে। আর আর্থিক সাহায্য হ্রাস পাবার ফলে বিভিন্ন প্রকল্প বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কমে যেতে পারে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতের অগ্রগামিতা। এমন অবস্থা যদি হয় তখনও হয়তো অর্থমন্ত্রী বলবেন যে দেশ বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর নয়। প্রত্যক্ষভাবে হয়তো আগের চেয়ে দেশ কম নির্ভরশীল। তবে পরোক্ষভাবে নির্ভরশীলতা অনেক বেশি। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আর্থিক নীতির পরিবর্তন, প্রচলিত ব্যবসা নীতির পরিমার্জন এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি না করলে বাংলাদেশের ভয়াবহ অবস্থা হবে। যদিও অর্থমন্ত্রী হয়তো তখনও বৈদেশিক সাহায্য, জাপানের নিশ্চুপ থাকা ইত্যাদি নিয়েই গালভরা বক্তৃতা দেবেন।

এদেশের রাজনীতিবিদ-মন্ত্রী, আমলা এই সম্প্রদায়ের মানুষের দুর্নীতির বিষয়টি নিয়ে কারো মনে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। সবাই জানে এরা দুর্নীতি করে

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ১৮ এপ্রিল জানিয়েছেন, দূতাবাস থেকে তাকে বলা হয়েছে যে, তাদের ঐ আন্ডার সেক্রেটারি শুধুমাত্র ধারণার বশবর্তী হয়ে এই অভিযোগ করেছেন। তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে তা অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু সংবাদ সম্মেলনে হ্যানসেন সাংবাদিকদের কোনো প্রমাণ পত্র দেখাননি, শুধু বলেছিলেন প্রয়োজনে ভবিষ্যতে সব কিছু প্রকাশ করা হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, হ্যানসেনের বক্তব্য আর দূতাবাসের বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট স্ববিরোধিতা রয়েছে।

কর্নেল আকবর বলেছেন তিনি মানহানির মামলা করবেন। খুব ভালো কথা। মিথ্যা অভিযোগ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, দেশের বিরুদ্ধে

স্ত্রীর পরিবারের সদস্যরা মন্ত্রীর সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সুবিধা আদায় করে থাকেন। এই স্ত্রী মন্ত্রীর ওপর যথেষ্ট খবরদারি করে থাকে।

কর্নেল মুজিব নামে যে ব্যক্তিটি মন্ত্রণালয়ে গিয়েছিল সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে তার পরিচয় বেরিয়ে এসেছে। তার পুরো নাম কর্নেল (অবঃ) মুজিবর রহমান খান। গুলশানে অবস্থিত আল কাফ হিফ লিমিটেডের কর্ণধার তিনি। মুজিবর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানা যায়, 'ডেনমার্কের বিআর মেরিন কোম্পানির সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত। এদেশের ড্যানিডার বিভিন্ন প্রজেক্টে তারা লোকাল কোম্পানি হিসেবে কাজ করে থাকেন। বিআর মেরিন কোম্পানি কোপেনহেগেনে অবস্থিত। দু' বছর আগে থেকে এই কোম্পানির সঙ্গে তিনি জড়িত রয়েছেন বলে জানান। এই প্রজেক্টে কর্নেল মুজিব তার সম্পৃক্ততার সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানান, 'ডেনিডার এই প্রজেক্টেও আমরা পরামর্শক হিসেবে কাজ করছি।' মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'দূতাবাস থেকে কখনই আমাকে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়নি। মন্ত্রণালয় বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার জন্য আমার ওপর দোষ চাপাচ্ছে। একটি মন্ত্রণালয়ের সচিব হয়ে গোলাম রহমান কিভাবে এত মিথ্যা কথা বলে আমি বুঝতে পারি না।'

ড্যানিশ রাষ্ট্রদূতের চিঠি

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত নেইল সেভারেইন মুস্ক অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমানকে লেখা চিঠিতে বলেন, আরিচায় চারটি ফেরি পুনর্বাসনের প্রক্রিয়াটি দু' বছরেরও বেশি সময় ধরে ঝুলে আছে। গত ২০০১ সালের নবেম্বর মাসে বার্ষিক খাত পর্যালোচনা দল ও বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সংস্থার মধ্যে বৈঠকে কী প্রক্রিয়ায় ডেনিশ যৌথ উদ্যোগের কোম্পানিটির সঙ্গে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছা যায় সে ব্যাপারেও ঐকমত্য হয়।

চিঠিতে বলা হয়, ডেনমার্কের চুক্তির সমঝোতা প্রক্রিয়াটি নিশ্চিতভাবে যাতে অগ্রসর হতে পারে সেজন্য ডেনিশ দূতাবাস নৌপরিবহন সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করে সচিব, বিআইডব্লিউটিসি এবং দূতাবাসের মধ্যে বৈঠক করার অনুরোধ জানায়। এ বৈঠকে সচিবের কাছে সমঝোতা কৌশলের একটি কপি হস্তান্তর করা হয় এবং কীভাবে সমঝোতা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সেখানে এ কথাও বলা হয় যে, সমঝোতা কৌশল অনুযায়ী চুক্তির পরিমাণ নির্ধারণের এখতিয়ার বিআইডব্লিউটিসি প্রতিনিধিদের থাকবে। আলোচনার ভিত্তিতে এ বিষয়ে একমত পোষণ করা হয় যে, কোনো রকম বিলম্ব ছাড়াই সমঝোতা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যেতে পারে।

চিঠিতে বলা হয়, সে অনুসারে যৌথ উদ্যোগে বিআইডব্লিউটিসি রো-রো ফেরি পুনঃস্থাপনের কাজের চুক্তিটি খসড়া সমঝোতাসহ জানুয়ারির মধ্যে শেষ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে ডেনমার্কে বাংলাদেশ সরকারের যে দু'জন প্রতিনিধি গিয়েছিলেন তাদের চুক্তি অনুমোদনের কর্তৃত্ব না দেয়ায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ২৯ জানুয়ারির (২০০২) মধ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় জানিয়ে দেবে যে সমঝোতার চুক্তিতে তারা সম্মত কিনা।

রাষ্ট্রদূত বলেন, ২৬ জানুয়ারি এক বৈঠকে যোগদানের পর দূতাবাসের কাছে এটা পুরষ্কার হয়ে যায় যে, যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশী শিপইয়ার্ডের সঙ্গে উপ-চুক্তির বিস্তারিত না জেনে মন্ত্রণালয় সমঝোতা চুক্তি গ্রহণ করবে না। ২৭ জানুয়ারি এক পত্রে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়। ২৮ জানুয়ারি দূতাবাসের পত্রে এ বিষয়ে নীতিগতভাবে অনুমোদন চেয়ে বলা হয় যে, এ বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে প্রত্যুত্তর প্রয়োজন।

এক সপ্তাহ পেরিয়ে যাওয়ার পরও কোনো উত্তর আসেনি। তবে দূতাবাস ৬ ফেব্রুয়ারি এক বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের জবাব জানতে পারে। সেখানে মন্ত্রী স্পষ্ট বলেন, প্রস্তাবিত পরিকল্পনা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কোনো বিষয় না বরং এটি অর্থ মন্ত্রণালয় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। তিনি আরো বলেন, এটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে কেননা এ কাজের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নসাপেক্ষ।

চিঠিতে বলা হয়, এই পরিস্থিতিতে ড্যানিশ সরকারের পক্ষে বাংলাদেশে এই উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, ড্যানিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই যৌথ উদ্যোগের সমঝোতা চুক্তিটি বাতিল করেছে এবং এটি বাস্তবায়নে বিকল্প কোনো কিছুর কথা আর ভাবা হবে না।

তাছাড়া নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ব্যাপক অনিয়মের কারণে ড্যানিশ সরকার বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন খাতে সকল প্রকার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সহযোগিতার বিষয়ে সতর্কতার সঙ্গে পুনঃপরীক্ষণ করতে বাধ্য হবে।

করলে অবশ্যই মানহানির মামলা হওয়া প্রয়োজন, শুধু হুমকি নয়। ফার ইস্টার্ন ইকনোমি রিভিউতে অতি নিম্নমানের চতুর্থ শ্রেণীর একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হলো। ফায়ার ফার ইস্টার্ন ইকনোমি রিভিউ-এর বিরুদ্ধে মামলা করবে। কোনো তথ্য প্রমাণ ছাড়া রিপোর্টের বিরুদ্ধে মামলা করলে বাংলাদেশের জেতার ভালো সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সরকারের মামলা করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত আর জানা গেল না। ইতিমধ্যে এই রিপোর্ট প্যারিসের আর একটি পত্রিকায় ছেপেছে। অথচ সরকার এখনো কোনো সিদ্ধান্তই নিতে পারলো না। জনগণ ভোট দিয়ে রাজনীতিবিদদের মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ করে দেয়। দেশের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব পড়ে তাদের ওপর। কিন্তু তারা সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন না। নিজেরা পুরোপুরি দুর্নীতিতে নিমজ্জিত থাকে বলে দেশের সম্মানহানি ঘটলেও তারা কোনো উদ্যোগ নিতে পারেন না। ফার ইস্টার্ন ইকনোমির বিরুদ্ধে মামলা করলে 'দেশের ভাবমূর্তি' কিছুটা হলেও ফিরিয়ে আনা সম্ভব হতো। কিন্তু সেক্ষেত্রে মন্ত্রীদের আরো অনেক দুর্নীতির অপ্রকাশিত খবর প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। তাই দেশের সম্মানহানি হলেও তারা কিছু করেন না, করতে পারেন না। ড্যানিডা কর্নেল আকবরের বিরুদ্ধে যে অভিযোগটি করেছে, সেটা নিঃসন্দেহে দুর্বল। এর বিরুদ্ধে সরকার আসলে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে না। কারণ ড্যানিডা কর্নেল আকবরের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ যদি প্রমাণ করতে নাও পারে, অন্য অনেক অভিযোগ তারা প্রমাণ করতে পারবে। বাংলাদেশের মন্ত্রী-রাজনীতিবিদ, আমলাদের অনেকের দুর্নীতির প্রমাণ ড্যানিডা বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের হাতে আছে। যে দেশে একজন রাজনীতিবিদ নির্বাচনে জেতার জন্য ২৫ কোটি টাকা খরচ করে, সে দেশের দুর্নীতির অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

ড্যানিডা বিষয়টি নিয়ে ডেনিশ রাষ্ট্রদূত পিটার লাইশল্ট হ্যানসেন সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মওদুদ আহমদ, যোগাযোগ মন্ত্রী নাজমুল হুদা এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব আনিসুল হক চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী আকবরের বিরুদ্ধে অভিযোগের আগেই। মন্ত্রীরা তখন তাকে বলেছিলেন, এটা শুধুই ভুল বোঝাবুঝি। সরকারের দায়িত্বশীল

সরকার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করলে বা ঝুলিয়ে রাখলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এই বিশাল পরিমাণ অর্থ প্রত্যাহার করে নিতে পারে। তখন সরকারের ভাবমূর্তির অবস্থা কী হবে?

কোনো ব্যক্তি বা মন্ত্রী তার দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করেননি। ওইসব কমিটমেন্টহীন বড় বড় মন্ত্রীরা যেটাকে 'ভুল' বোঝাবুঝি বলে উড়িয়ে দিতে চাইছিলেন, সেটার কারণেই বিএনপি সরকারের মন্ত্রীরা এখন দুর্নীতিবাজ হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছেন।

ড্যানিডা সংবাদ সম্মেলনে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্তব্য করেছে। যেমন মানবাধিকার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, ন্যায়পাল নিয়োগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন প্রভৃতি বিষয়ে সরকারের স্থবির নীতির সমালোচনা করেছে। এই বিষয়গুলো বিএনপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ক্ষমতায় গিয়েই কার্যকর ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু ক্ষমতার ছয় মাসে এই বিষয়গুলোতে তারা কোনো ব্যবস্থা তো নেয়ইনি। ব্যবস্থা যে নেবে সেরকম কোনো আলামতও সৃষ্টি করতে পারেনি। স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন প্রশ্নে সরকারের কোনো উদ্যোগ বা চিন্তা আছে বলে মনে হয় না। ন্যায়পাল নিয়োগের বিষয়ে বিএনপি সরকার এখন বলছে যোগ্য লোক নেই। কী অদ্ভুত কথা! যোগ্য লোক নেই তো ঘোষণা দিয়েছিলেন কেন? পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আপনাদের নীতি পরিষ্কার নয় কেন? পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান সন্তু লারমার সঙ্গে আলোচনা শুরু করতেই আপনাদের ছয় মাস লেগে গেল। আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত আসতে কতদিন লাগবে? ডোনাররা এখনই সিদ্ধান্ত চায়। কিন্তু সরকারের কাজের যে গতি তাতে মনে হয় না দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত আসবে। ডোনাররা পার্বত্য চট্টগ্রামে সাহায্য দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে। তারা চুক্তি বিষয়ে সরকারের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত জানতে চায়। চায় পার্বত্য চট্টগ্রামে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন। শুধু ইউরোপিয়ান ইউনিয়নই ৬০ মিলিয়ন ইউরো সাহায্য দিতে চায় পার্বত্য চট্টগ্রামে। তারা দীর্ঘদিন ধরে এই পরিমাণ অর্থ নিয়ে বসে আছে। সরকারের স্থবিরতা এবং সিদ্ধান্তহীনতার কারণে তারা কাজ করতে পারছে না। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সন্তু লারমার সঙ্গে প্রথম বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন করার আগ্রহ দেখিয়েছেন। কিন্তু চুক্তির বাস্তবায়ন এবং আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি করতে হলে দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন সরকারের। পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে ইউপিডিএফ নামধারী একটি সন্ত্রাসী সংগঠন। মানুষ খুন আর চাঁদাবাজি যাদের পেশা। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রশাসন এবং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তাদের শেল্টার দেয়ার। ঢাকার শাহবাগের আজিজ মার্কেটে অফিস নিয়ে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করতে চাইলে সরকারের কঠোর এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা প্রয়োজন। সরকার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করলে বা ঝুলিয়ে রাখলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এই বিশাল পরিমাণ অর্থ প্রত্যাহার করে নিতে পারে। তখন সরকারের ভাবমূর্তির অবস্থা কী হবে?

৬ মাস বয়সী বিএনপি সরকারের সবচেয়ে বড় পরিচিতি তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। মূলত সিদ্ধান্তহীনতার কারণেই সরকারের এই লেজেগোবরে অবস্থা। শুরুতেই ষাট সদস্যের একটি বিশাল মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে রেকর্ড করেছে। এই মন্ত্রিসভার ভেতরে আবার রয়েছে কমপক্ষে তিনটি গ্রুপ। কাজ করার চেয়ে এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের পেছনে লেগে থাকতেই যেন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তার ওপর আবার রয়েছে হাওয়া ভবন। নির্বাচনের আগে হাওয়া ভবনের কার্যক্রম ছিল খুবই প্রশংসিত। তারেক জিয়া হাওয়া ভবন থেকে বিএনপি'র নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন অসম্ভব দক্ষতার সঙ্গে। বিএনপি'র নির্বাচনে ভালো করার পেছনে হাওয়া ভবনের অবদানের কথা বিএনপি বিরোধীরাও স্বীকার করেছেন। সেই হাওয়া ভবনের দিকে এখন সবার দৃষ্টি। হাওয়া ভবনকে কেন্দ্র করে এখন আলোচনা হচ্ছে সরকারের ব্যর্থতার। যার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছেন তারেক জিয়া। মন্ত্রিপরিষদের ভেতরের প্রভাবশালী একটি অংশ প্রায় প্রকাশ্যেই বলছেন হাওয়া ভবনের কারণে তারা কাজ করতে পারছেন না। হাওয়া ভবন নাকি সর্বত্রই হস্তক্ষেপ করছে। যে কোনো ব্যবসা বাণিজ্যের কমিশন দিতে হয় নাকি হাওয়া ভবনকে। একই রকম কথা বলছেন আমলাদের একটি অংশও। হাওয়া ভবন তথা তারেক জিয়ার বিরুদ্ধে এমন অসংখ্য অভিযোগ উঠছে। যার পেছনে বিএনপি'র অনেক মন্ত্রীর অবদান আছে।

ড্যানিডা যখন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানকে জানালো, তখন তিনি কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিলেন না কেন? অর্থমন্ত্রীর কাজ তো শুধু কথা বলা নয়। এই পদক পাওয়ার দায়-দায়িত্ব তো তার ওপরও পড়ে

কিছুদিন আগে ভারতের 'আউটলুক' পত্রিকা তারেক রহমানকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যেখানে হাওয়া ভবনকে বিএনপি সরকারের ক্ষমতার অন্যতম উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কোনো ব্যবসাই নাকি তারেক জিয়া বা তার লোককে কমিশন না দিয়ে করা যায় না। কিন্তু তারেক জিয়া বা বিএনপির পক্ষ থেকে আউটলুকের রিপোর্টের কোনো প্রতিবাদ করা হয়নি। তারা হয়তো ভাবছেন এই রিপোর্টকে এত গুরুত্ব দেয়ার কিছু নেই। কিন্তু একজনের বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ ওঠে এবং অভিযোগগুলো যদি সত্য না হয়, তাহলে এর প্রতিবাদ তো করতে হবে। প্রতিবাদ না করলে তো মিথ্যাও সত্য হয়ে যায়। আর একটি বিদেশী পত্রিকা যা ইচ্ছে তাই কী লিখে দিতে পারে? যার বিরুদ্ধে লিখবে সে কোনো ব্যবস্থা নেবে না?

হাওয়া ভবনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো উঠেছে তার সবই কী মিথ্যা? তারেক জিয়া নিজে কিছু না করলেও তার নাম ভাঙিয়ে যে কিছু হচ্ছে না, সেটা কী জোর দিয়ে বলা যায় । যদি এমন কিছু হয়ে থাকে তাহলে তার প্রতিকার তো তারেক জিয়াকেই করতে হবে। না করলে মন্ত্রীদের মতো তার ভাবমূর্তি নিয়েও তো প্রশ্ন দেখা দেবে। এটা তার নিজের জন্য যেমন চরম ক্ষতিকর, ক্ষতিকর বিএনপি'র জন্যেও।

সিদ্ধান্তহীন এই সরকার সম্প্রতি আরো একটি কাজ করে সমালোচিত হয়েছে। নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে তারা কিছু মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এর মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ চৌধুরীর চারটি মামলাও রয়েছে। রাজনৈতিক মামলার ক্ষেত্রে হয়তো এটা হতে পারে। কিন্তু আলতাফ চৌধুরীর মামলা তো রাজনৈতিক মামলা নয়। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় ও আত্মসাতের অভিযোগে হয়েছিল এই মামলাগুলো। বিচারে তিনি খালাস পেলে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু এভাবে নির্বাহী আদেশে মামলা তুলে নিলে আর যাই হোক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে না। অন্য দুর্নীতিবাজরা উৎসাহ পাবে। দুর্নীতিবাজরা কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে এক মুহূর্তেই হয়ে যাবেন রাজনীতিবিদ। তারপর মন্ত্রী। তারপর এক কলমের খোচায় মামলা থেকে অব্যাহতি। এ চিত্র হয়ে পড়বে চিরন্তন। আর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের স্বপ্ন বক্তৃতাতেই থেকে যাবে।